প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস চর্চার প্রেরণা

স্বদেশ প্রীতি, ইতিহাস প্রীতি, স্বদেশের ইতিহাসহীনতা এবং বিদেশীয় ও বিজাতীয়দের ভ্রান্তিমূলক ইতিহাস-চর্চাই প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে স্বদেশের ইতিহাস বিষয়ে সত্যানুসন্ধিৎসার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। স্বদেশের ইতিহাসহীনতা সম্পর্কে বঙ্কিম-চন্দ্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন – "দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত নাই।"[১] রবীন্দ্রনাথও বেদনাহত কণ্ঠে বলেছেন — "সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী .... আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না ; যদিবা ভারত সাহিত্যে ইতিহাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই।"[২]

বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ম্যাকডোনেল একদা অভিযোগের সুরে বলেছিলেন— "History is the one weak spot in Indian literature. It is in fact, non-existance. The total lack of the historical sense is so characteristic, that the whole course of Sanskrit literature is darkened by the shadow of this defect, suffering as it does from an entire absence of exact choronology".[৩] আর এ বিষয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের নিরাসক্ত উক্তি —
"It is well-known fact that with the single exception of the Rajtarangini (History of Kashmir) there is no historical text in Sanskrit dealing with the whole or even parts of India."[৪]

আধুনিক যুগে, পন্ডিতজন স্বীকৃত ইতিহাস লিখন প্রণালীর বিচারে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইউরোপ ভারতবর্ষের তুলনায় প্রাচীনত্বের দাবী রাখে — এ মত সত্য। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চেতনার অভাব ছিল এবং প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাস

রচনার মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, এ মত সর্বাংশে সত্য নয়।

'ইতিহাস' কথাটি আমরা প্রথম পাই অথর্ববেদ-সংহিতাতে। যথা — "তমিতিহাসশ্চ পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্।"[৫] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী — এই চারপ্রকার লৌকিক সাহিত্য প্রচলিত ছিল। নারাশংসী হল পুরোহিত ও রণসঙ্গীত গায়কদের দ্বারা গীত রাজাদের মহত্ত্ব ও বীরত্বমূলক কীর্তিকথা, আর গাথা বলতে আমরা বুঝি লোকচিত্তাকর্ষক কোন কাহিনী অবলম্বনে রচিত গীতি কবিতা। কিন্তু এখানে ইতিহাস ও পুরাণ শব্দের দ্বারা সঠিক কি বোঝান হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। খুব সম্ভব 'পুরাণ' কথার অর্থ অতিপ্রাচীন কাহিনী এবং ইতিহাস বলতে বোঝান হয়েছে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ঘটনার বিবরণকে।

পরবর্তীকালে 'ইতিহাস' কথাটি আমরা মহাভারতে পেয়েছি, এবং সেখানে ইতিহাসকে পুরাণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করা হয়েছে। যথা —

"পুরাণ সংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্মার্থ সংশ্রিতা।
ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাণাম ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম।।"[৬]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ইতিবৃত্তের আলোচ্য বিষয় রাজা ও ঋষিদের বিবরণ, আর পুরাণে থাকে প্রধানত ধর্মবিষয়ক প্রাচীন কাহিনী।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদের পরে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হয়েছে — "ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বণশ্চতুর্থ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ।"[৭] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও ইতিহাসকে পঞ্চমবেদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং ইতিহাস কথাটির তাৎপর্যমূলক ব্যাখ্যাও আমরা প্রথম পাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে — "পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ।"[৮] আধুনিক কালের ঐতিহাসিক কৌটিল্যের এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন —

"It would thus appear that Itihasa, as understood by Kautilya, not only included historical Chronicles in the widest sense of

the term, but many things more, and may be said to comprise almost all the topics concerning a man outside the sphere of religion. It seems to embress the study not only of historical persons and events, but also of traditions concerning them,the political, social, moral and economic thories and their practical applications, legal usages and institutions etc." ১

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শুধু 'ইতিহাস' কথাটির তাৎপর্যমূলক ব্যাখ্যাই নেই, সেই সঙ্গে অতি উচ্চাঙ্গের ইতিহাস-লিখন-প্রণালী সম্পর্কে প্রকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। দ্বাদশ শতকে 'রাজতরঙ্গিণী' অথবা কাশ্মীরের ইতিহাস প্রণেতা কল্হণ ইতিহাস প্রণয়নের যে সব আদর্শ ও প্রণালীর কথা বলেছেন তা' থেকে প্রমাণ হয় যে, সে যুগেও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার মূল সূত্রগুলি অজ্ঞাত ছিল না। কল্হণ স্পষ্ট বলছেন –

" শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষ - বহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী।। ১০

অর্থাৎ সেই গুণবানই প্রশংসনীয় (শ্লাঘ্য) ভূতার্থ কথনে (ইতিহাস কথনে) যাঁর বাণী (সরস্বতী) বিচারকেরই মতো (স্থেয়স্যেব) রাগদ্বেষ - বর্জিত। ঐতিহাসিকের বিবরণে অযৌক্তিক প্রীতি অথবা বিরূপতার স্থান নেই। কারণ, ইতিহাস শুধুমাত্র সত্য এবং একমাত্র সত্যকাহিনী।

আধুনিককালের ঐতিহাসিক কল্হণের কৃতিত্ব বিচার করতে গিয়ে বলেছেন — "Kalhana had the supreme merit of possessing a critical mind and that sperit of scepticism which is the first virtue of a historian. He questioned the veracity of past historians, and examined their statements in the light of available evidence culled from the various sources mentioned above. He found fault with the pedantic style of Suvrata, who had acquired celebrity by epitomizing the volumious works containing the early history of the kings of Kashmir; he corrected the error which Ksmendra Committed

in his 'List of Kings' owing to an incomprehensive lack of care; and he scrutinized eleven works of former savants containing the annals of kings, as well as the views of Sage Nila (VV.11-14)".[১১]

তবে প্রাচীন ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, প্রাচীন ভারতে কল্‌হণ একমাত্র ঐতিহাসিক এবং 'রাজতরঙ্গিণী' একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সাহিত্যের অভাব সম্পর্কে ম্যাকডোনেল প্রধানত দুটি কারণের কথা বলেছেন — "In the first place, early India wrote no history because it never made any, secondly, the Brahmans, whose task it would naturally have been to record great deeds, had early embraced the doctrine that all action and existance are a positive evil, and could therefore have felt but little inclination to chronicle historical events."[১২]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসহীনতা সম্পর্কে ম্যাকডোনেল যে প্রথম কারণের কথা বলেছেন তা' রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমতের মধ্য দিয়ে আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে অনুধাবন করতে পারি — "দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ কোনো একটি এক - অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতবর্ষের কোনো একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে অধিক ঘটে নাই।

কোনো দেশের লোক যখন এইরূপ ঐক্য উপলব্ধি করে, তখন তাহারা স্বভাবতই সেই উপলব্ধিকে ইতিহাসে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না, যে সকল ঘটনা বিচ্ছিন্ন, যাহা আকস্মিক, দেশের লোকের চিত্তে যাহার কোনো অখণ্ড তাৎপর্য নাই, দেশের লোক

তাহাকে সহজেই ইতিহাস রূপে গাঁথিয়া রাখে না ; কারণ গাঁথিয়া রাখার কোনো একটি সূত্র তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে পায় না।" [১৩]

দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে গভীর ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় — " ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যু জাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব' অশুভের নাম 'দুর্দৈব'। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত ; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্তা আপনাদিগকে মনে করেন না ; দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগের ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত ; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত ; সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোনো কার্যের কেহ নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণকীর্তনের প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।" [১৪]

ভারতবর্ষের ইতিহাসহীনতা এবং ইতিহাসহীনতার কারণ সম্পর্কে যা বলা হল তা' বাংলাদেশের ইতিহাসহীনতা এবং ইতিহাসহীনতার কারণ সম্পর্কে অধিকতর প্রযোজ্য। বঙ্কিম চন্দ্রের মতে — " যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার।" [১৫] তিনি আরও বলেছেন — " এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে পিতৃপিতামহের নাম জানে না ; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।" [১৬]

ইতিহাসহীনতা বাঙালির প্রধান কলঙ্ক। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নেই। তবে ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমতার কারণেই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসহীনতার দুরপনেয় কলঙ্ক মোচনের জন্য আমরা প্রথমতঃ সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' কাব্যটির কথা উল্লেখ করতে

পারি। তবে 'রাজতরঙ্গিণী' তে যেমন ধারাবাহিক ভাবে কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে 'রামচরিতম্' কাব্যে তেমন ভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস বলা হয়নি।

'রামচরিতম্' কাব্যটির রচনাকাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং কাব্যবর্ণিত ঘটনার কবি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কাব্যটির একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে আবিষ্কার করেন এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। চারটি পরিচ্ছেদে রচিত এই কাব্যটি " ভারতীয় সাহিত্যে বোধ করি প্রথম সমসাময়িক (contemporary) ঐতিহাসিক পদ্যকাব্য।"[১৭]

একাদক শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম মহীপালের প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০–৭৫) প্রজাপীড়ন করায় কৈবর্ত নায়কদের নেতৃত্বে, গৌড়রাজ্যের কেন্দ্র ভাগে, বরেন্দ্রদেশে প্রবল প্রজা–বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহীদের হাতে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যু ঘটে। এর কিছুকাল পরে দ্বিতীয় মহীপালের ভাই রামপাল (১০৭৭–১১২০) কৈবর্ত নায়কদের পরাজিত করে বরেন্দ্রদেশ পুনরুদ্ধার করেন। 'রামচরিতম্' কাব্যে সন্ধ্যাকর নন্দী দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় একই সঙ্গে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার কাহিনী ও পালকুলতিলক রামপালের বরেন্দ্রভূমি পুনর্জয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কবি নিজেই কাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত সংস্কৃত টীকা রচনা করে গেছেন এবং তার সাহায্যেই কাব্যের পৌরাণিক অংশের সঙ্গে ঐতিহাসিক অংশের সাদৃশ্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। প্রবোধ চন্দ্র সেন বলেছেন — " গ্রন্থকার বাংলার ইতিহাসের একটি দারুণ বিপ্লবের সাক্ষী। ফলে এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ, তাম্রশাসনাদি লেখা - সমূহ থেকে তার মূল্য বেশী বই কম নয়।"[১৮] গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (১৮৯৪) তিন বছর পরে আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া ও বক্তব্য আমরা জানতে পারি না।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম চৈতন্যজীবনী গ্রন্থাবলী। মধ্যযুগে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অলোকসামান্য জীবন মহিমার প্রভাবে বাঙালি জাতি একবার হিন্দু–মুসলমান ভুলে, ধর্ম বর্ণ ভুলে, রাঢ়ী বারেন্দ্র ভুলে একাভিমুখী ব্রতের সাধনায় জাগ্রত ও উদ্যত হয়েছিল।

তার প্রমাণ চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরদের চরিতকাব্যসমূহ। কাব্যপর্যায়ভুক্ত হলেও এগুলি ইতিহাস রক্ষার তাগিদে রচিত। এই কাব্যগুলি থেকে বাংলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে ইতিহাস চেতনাও অনৈহিকতা ও অলৌকিকতার মরীচিকায় পথভ্রষ্ট হয়ে অর্দ্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রাচীন বাংলা তথা প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচয়িতা ও ইতিহাস গ্রন্থের অভাব ছিল — একথা সত্য। কিন্তু মধ্যযুগীয় ভারতে মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী (chronicles) যেমন ছিল প্রচুর, তেমনি ইতিহাস রচয়িতা ও ইতিহাস গ্রন্থের অভাব ঘটেনি। এই সব ইতিহাস রচয়িতার কিছু দুর্বলতা ও আদর্শচ্যুতির কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, তাঁদের ইতিহাস-বোধ ছিল বেশ উচ্চমানের এবং তাঁরা ইতিহাস রচনার শুচিতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

মধ্যযুগের কয়েকটি বিশিষ্ট ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কাজী মিনহাজ-ই-সিরাজ জোজজানী কর্তৃক ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে (৬৫৮ হিঃ) রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থটির কথা। এই বিরাট গ্রন্থটি ভারতবর্ষ তথা তদানীন্তন মুসলমান জগতের প্রাচীনতম প্রামাণ্য ইতিহাসগুলির মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার বিষয়ের কাহিনী সমন্বিত প্রাচীনতম ইতিহাস গ্রন্থ।

সুলতান শামস্-উদ্-দীন ইলুতুৎমীশের পুত্র সুলতান নাশির-উদ্-দীন মাহ্মুদের রাজত্বকালে (১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন) এবং তাঁরই নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে মিন্হাজ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থ রচনা করেন। 'তবকত' শব্দের অর্থ 'কাহিনী'। 'তবকত'-এর বহুবচন 'তবকাত'। এখানে 'তবকাত-ই-নাসিরী'র অর্থ সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদের কাহিনী অথবা তাঁকে উপলক্ষ্য করে লেখা কাহিনী।

ইসলামের অভ্যুদয়ের কাল থেকে আরম্ভ করে আরব-আজমের সমুদয় মালিক ও সুলতানের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক রাজবংশের উপর পূর্ণ আলোকপাত করে তাঁদের কীর্তিসমূহের দৃষ্টান্তগুলিকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে ২৩টি ভাগে (তবকাতে) বিভক্ত করে মিন্হাজ এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১২২৬–২৭ খ্রিস্টাব্দ (৬২৪ হিঃ) থেকে আরম্ভ করে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ (৬৫৮ হিঃ) পর্যন্ত এই উপমহাদেশে সংঘটিত অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তার আগের ঘটনাবলীর অর্থাৎ সুলতান মোহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের সময় থেকে আরম্ভ করে ৬২৪ হিজরী সনে (১২২৬–২৭ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থকারের সিন্ধু-রাজ্যে আগমন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেগুলি তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মুখ থেকে শ্রবণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

'তবকাত্–ই–নাসিরী' গ্রন্থকে ভারতবর্ষে মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ বলা যায় না। এর আগে, ১২২৮–২৯ খ্রিস্টাব্দে (৬২৬ হিঃ) 'তাজ–উল–মাসির' নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন হাসান–নিজামী। এই গ্রন্থে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে সংঘটিত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত অথচ মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আছে। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বিশেষ কোন বর্ণনা এ গ্রন্থে প্রায় নেই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলমানদের রচিত প্রথম ইতিহাস হিসাবে 'তবকাত্–ই–নাসিরী' গ্রন্থের কথা স্মরণ করতে হয়।

মিন্‌হাজ তাঁর গ্রন্থের ২০, ২১ ও ২২ তবকতে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। শুধু দুই বছরের (৪৪১ ও ৪৪২ হিঃ) ঘটনাবলীর তিনি প্রত্যক্ষ-দর্শী ছিলেন। মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী কর্তৃক নওদীহ্ অধিকারের সময় থেকে আরম্ভ করে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াস–উদ্–দীন খলজীর পরাজয় পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে যে সমস্ত ঘটনা মিন্‌হাজের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে সেগুলি সম্পর্কে গ্রন্থকারের কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিলনা। কারণ, মিন্‌হাজ সর্বপ্রথম ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে রচিত সে সময়কার যে সমস্ত বিবরণ মিন্‌হাজ তাঁর গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত করেছেন তাতে এমন অনেক বিষয় আছে যা অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। সে সমস্ত বর্ণনার উপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা কঠিন। তবে মোটামুটি ভাবে সে সমস্ত বর্ণনার কাঠামো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে ; যদিও বিস্তারিত বর্ণনায় অনেক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই, বঙ্কিমচন্দ্র

মিন্‌হাজ বর্ণিত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনীকে মেনে নেননি।

বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে মিন্‌হাজের গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁর বর্ণনা ভিন্ন বাংলাদেশ সম্পর্কে সে যুগে আর কোনো ইতিহাস কেউ লিখে গেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। শত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও মিন্‌হাজের বর্ণনাই একমাত্র সূত্র যার থেকে সে যুগের বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা করা যায়। গ্রন্থটির গুরুত্ব আমরা আরও বেশী করে উপলব্ধি করি যখন দেখি যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (২য় খন্ড) গ্রন্থে পদে পদে পাদটীকায় 'তবকাত্‌-ই-নাসিরী' গ্রন্থটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

'তবকাত্‌-ই-নাসিরী' গ্রন্থটি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে W.N.Less- এর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম কলকাতায় মুদ্রিত হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি Major H.G. Raverty-র হাতে পড়ে। গ্রন্থটি তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তিনি মুদ্রনে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন। পরে তিনি ১২টি পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তিনি গ্রন্থটির প্রথম ছ'টি তবকাত্‌-এর অনুবাদ দেননি, পরিবর্তে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। পরবর্তী ১৭টি তবকতের প্রায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন। তিনি গ্রন্থমধ্যে যে বিস্তারিত পাদটীকা দিয়েছেন তা' অত্যন্ত মূল্যবান। গ্রন্থটি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

"On June 23, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began."[১১] মধ্যযুগের অবসানে, বাংলাদেশে আধুনিক যুগের আগমন হল। পলাশীর যুদ্ধে বঙ্গবিজয়ের পর ইংরেজ এক নতুন শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত ; তাহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগেরই কীর্ত্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্ত্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এই জন্য গর্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য ; ....।"[20] এই গর্বিত জাতির হাত ধরেই বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার সূচনা।

আধুনিক যুগে, বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার সূচনা পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পরে, ইংরেজ শাসকদের উৎসাহ ও আনুকূল্যে। ১৭৬৩–৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন শাসক হেনরী ভ্যান্‌সিস্টার্ট (১৭৬০–৬৪) - এর উৎসাহে সলিমুল্লা ফার্সি ভাষায় 'তরিখ–ই–বঙ্গাল' নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের ইতিহাস সংকলন করেছেন। এক হিসাবে আধুনিক কালে বাংলার ইতিহাস সংকলনের এটাই প্রথম প্রয়াস। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্লাডউন 'A Narrative of Transaction of Bengal' নামে 'তরিখ–ই–বঙ্গাল'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। পরবর্তীকালে গোলাম হুসেন সলিম তাঁর 'রিয়াজ–উস–সলাতিন' গ্রন্থটি রচনার সময় 'তরিখ–ই–বঙ্গাল' থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে 'সয়ের - মুতাক্ষরিণ' নামক গ্রন্থে ফার্সি ভাষায় বাংলার নবাবী আমলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেন সৈয়দ গোলাম হোসেন খান্ তবাতবাই। গ্রন্থে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনা গ্রন্থকারের জ্ঞানগোচর ছিল। কারণ, এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান হিসাবে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে এবং পরে স্বয়ং জীবনের অনেকটা সময়ই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব দরবারে কাটিয়েছেন।

গ্রন্থটির হ্রস্ব নাম 'সয়ের–মুতাক্ষরিণ'। তবে গ্রন্থটির পূর্ণনামেই এর তাৎপর্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা বোঝা যায়। পূর্ণনামের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ : "লেখকের দৃষ্টিতে বর্তমান যুগ (১৭০৭–৮৩) : হিন্দুস্থানের শেষ সাতজন সম্রাটের রাজত্বকালের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলা ও সুজাউদ্দৌলার পরিবারের উত্থান–পতনের বিস্তারিত বিবরণ সহ বিশেষ ভাবে বাংলায় ইংরেজদের যুদ্ধাবলীর একটি বিবরণ সম্বলিত এবং এই অঞ্চলে ইংরেজ সরকার ও তার শাসননীতি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিচার বিশ্লেষণ পুষ্ট।"

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের এক দীর্ঘপর্বের (১৭০৭–৮৩) ইতিহাস প্রথম লিপিবদ্ধ করেন সৈয়দ গোলাম হোসেন। কেন এই পর্বটি বাছা হল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন — "... For it is certain, that to this day no one has thought of filling up the chasm, by writing

the history of India since Aoreng-zib's demise. It is then, to put such a clue in his power, that I have imposed on myself this task : trusting therefore to my personal knowledge, and to what I have gathering from persons of eminent rank and credit, I have sturng the whole together in a plain unornamented style, where my errors shall be the more excusable, as a cite perpetually my authorities; and by God's blessing, I have entitled it "SEIR-MUTAQHERIN" (View of moderns time), as containing the whole series of events, from the year 1118 to the year 1195 since the venerable flight to the last and chief of messengers down to the present days."[২১]

প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই ইতিহাস গ্রন্থটি ওয়ারেন হেস্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু, বোধ হয়, সে সময়ে ইংরেজদের মধ্যে পারসিক জানা পন্ডিত ছিলেন না অথবা তাঁদের অনুবাদ করার মতো হাতে সময় ছিল না ; এই কারণে একজন ফরাসি কর্ণেল M. Raymond গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব নেন এবং ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে 'NOTA MANUS' এই ছদ্মনামে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

যে সময়ে এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল তখনও ভারতে ইউরোপীয় ইতিহাস লিখন প্রণালীর প্রভাব অনুভূত হয় নি। সে সময়ে এটাই ছিল কোন ভারতীয়ের রচিত সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনার নিদর্শন। গোলাম হোসেন ইতিহাস প্রণয়ণের প্রয়োজনীয়তা, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা' মোটামুটি ভাবে মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিহাস রচয়িতাদের বক্তব্যের পুনরুক্তি। তাঁর মতে, ইতিহাস ভগবানের সৃষ্টির সর্বমহৎ অংশের উপর এক ঝলক আলোকপাত করে এবং মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির তথ্য সংগ্রহ করে, তাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ, প্রধান নেতাদের গুণরাজি ও অনুগামীদের কার্যাবলীর পরিচয় দেয়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল, নীচতা, অনম্রতা ও অত্যাচারের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অপরকে হুঁশিয়ার করা এবং নিন্দনীয় কার্যকলাপ ও ব্যবহার থেকে তাদের রক্ষা করা।[২২]

James Mill এবং H.H.Willson তাঁদের 'History of British India' গ্রন্থে H.G.Keene তাঁর 'The Fall of the Mughal Empire' গ্রন্থে H.M.Elliot তাঁর 'The History of India as told by its own Historians' গ্রন্থে Charles Stewart তাঁর 'The History of Bengal' গ্রন্থে 'সয়ের-মুতাক্ষরিণ' থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং সকলেই গ্রন্থটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, পলাশীতে প্রকৃত পক্ষে কোন যুদ্ধ হয়নি, কেবল একটা রঙ্গতামাশা হয়েছিল মাত্র। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মুতাক্ষরিণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। [২৩] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রও মুতাক্ষরিণের বক্তব্যকে প্রামাণ্য বলে ধরেছেন।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালদহ অঞ্চলের কর্মচারী জর্জ উডনির নির্দেশে তাঁর ডাকমুন্সী গোলাম হুসেন সেলিম ফার্সি ভাষায় তাঁর সমসাময়িক কালের একটি ইতিহাস রচনা শুরু করেন এবং দু'বছর কঠোর পরিশ্রম করে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটির নাম রাখেন তিনি ''রিয়াজ-উস-সলাতিন'।' 'রিয়াজ' শব্দের অর্থ উদ্যানসমূহ এবং 'সলাতিন' শব্দের অর্থ 'নৃপতিবৃন্দ। ইংরেজি করে বলা যায় 'Gardens of Kings'.

এই গ্রন্থে তিনি প্রধানত মুসলমানদের বঙ্গবিজয় কাহিনী থেকে শুরু করে ইংরেজদের বঙ্গবিজয় কাহিনী পর্যন্ত ইতিহাসকে বিবৃত করেছেন। গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। চতুর্থ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ আছে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বাংলাদেশে পর্তুগীজ ও ফরাসিদের আগমন কথা এবং দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজদের বঙ্গবিজয় কাহিনী।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য গ্রন্থকার গৌড়, পান্ডুয়া ও পুরাতন মালদা অঞ্চলের নানা ধ্বংসাবশেষ ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন ও বহু পুরাতন পুঁথি পাঠ করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, লেখক কোন্ কোন্ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা' আমাদের জানান নি। তবে গ্রন্থ মধ্যে তার প্রমাণ আছে। যেমন তিনি মিনহাজের

'তবকাত্-ই-নাসিরী', জিয়াউদ্দিন বার্ণির 'তরিখ-ই-ফিরোজশাহী', নিজামুদ্দিন আহমেদের 'তরিখ-ই-আকবর শাহী', আবুল ফজলের 'আকবর নামা', সলিমুল্লার 'তরিখ-ই-বঙ্গাল' প্রভৃতি গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছিলেন।

গ্রন্থটি সম্পর্কে যদুনাথ সরকার বলেছেন — "মুসলমান শাসিত ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের পৃথক ইতিহাস পারসিক ভাষায় লেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক পত্রাবলীও রক্ষা পাইয়াছে। বাঙ্গালার পক্ষে সে রূপ ইতিহাস একখানি মাত্র 'রিয়াজ-উস-সলাতিন', তাহাও আবার পলাশীযুদ্ধের ত্রিশ বৎসর পরে ইংরাজ আমলে ইংরাজের আজ্ঞায় লেখা।'[২৪]

'ইংরাজ আমলে ইংরাজের আজ্ঞায় লেখা।' — ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের এই কথার মধ্যে যে আত্মমণের ঝাঁঝ আছে তার প্রধান কারণ বোধ করি যে গ্রন্থ সূচনাতেই লেখক তাঁর নিয়োগকর্তা জর্জ উডনিকে মহৎ চরিত্র, দয়ালু হৃদয়, বিজ্ঞ মানুষ বলে উচ্চ প্রশংসা করে তাঁর সম্মানিত দীর্ঘজীবন ও উচ্চতর পদমর্যাদা কামনা করেছেন এবং গ্রন্থ মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের প্রতি আনুগত্য হেতু ঐতিহাসিকের নিষ্পাচ্যুত হয়েছেন। গ্রন্থ শেষে ইংরেজদের উচ্চ প্রশংসা করে তিনি বলেছেন — "The English among the Christians are adorned with the head-dress of wisdom and ornamented with the garb of generosity of good maners. In resolution, activity in war and in festivities, in administering justice and helping the oppressed, they are unrevalled; and their truthfulness is so great, that they would not break a promise, should they even lose their lives. They admit no lier to their society, are pious, faithful, pitiful and honerable. They have neither learnt the letters of deceit, nor have they read the page of vice; and though their religion is opposed to ours, they do not interfere with the religion, rites and propagation of the Muhammadan faith."[২৫]

উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান প্রভৃতি সকলের প্রধান অবলম্বন ছিল 'রিয়াজ-উস-সলাতিন'। তাঁরা সকলেই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু যদুনাথ সরকারের মতে — "মখ্‌জন্‌ ও আকবর নামার বিরুদ্ধে যে যে স্থানে রিয়াজ কোন উক্তি করিয়াছেন, তাহা একেবারে বিবেচনার অযোগ্য। এবং তাহা লইয়া আলোচনা করাও সময়ের অপব্যবহার মাত্র; কারণ, ১৭৮৭ সালে লিখিত এই পুস্তকে গ্রন্থকর্তা কোনই প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধৃত, এমন কি, নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সূক্ষ্মভাবে রিয়াজ পরীক্ষা দেখা গেল যে, গ্রন্থকার মালদহে বসিয়া আকবর নামা, মখ্‌জন্‌ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ একেবারেই পান নাই; তৃতীয় শ্রেণীর কোন আধুনিক সংকলন মাত্র পড়িয়াছেন।" [২৬] ১৯০৪ সালে আবদুস সালাম গ্রন্থটির সটীক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে গ্রন্থটির কোন ইংরেজি অনুবাদ না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন নি। ফলে গ্রন্থটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য আমরা পাই না।

আমরা আগেই বলেছি যে, বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছিল ইংরেজ শাসকদের উৎসাহে। 'তরিখ-ই-বঙ্গাল', 'রিয়াজ-উস-সলাতিন' প্রভৃতি গ্রন্থ সে উৎসাহ ও প্রেরণারই ফসল। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাস-রচনা-প্রণালী বলতে আমরা যা বুঝি এই সব গ্রন্থের ক্ষেত্রে সে রচনাশৈলী অনুসৃত হয়নি। গ্রন্থগুলি মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতিহাসিক-দের ইতিহাস-চেতনা ও রচনা-প্রণালী অনুসারে লিখিত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ইউরোপীয় ইতিহাস-রচনা - প্রণালী অনুসারে, আধুনিক প্রণালীতে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছিল 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার (১৭৮৪) মধ্য দিয়ে।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোন্সের ভারতে আগমনের অনেক আগেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে এদেশে আসেন চার্লস উইলকিন্স (১৭৫০-১৮৩৫)। তিনিই বাংলা টাইপের নির্মাতা এবং বাংলা মুদ্রণের পথ প্রদর্শক। তাঁর প্রবর্তিত বাংলা টাইপের প্রথম প্রয়োগ হয় হ্যালহেডের ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণে (১৭৭৮)। খুব সম্ভব হ্যালহেডের কাছে উৎসাহ পেয়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেন এবং বারাণসীতে গিয়ে পণ্ডিতদের কাছে খুব ভালোভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। উইলকিন্সই সংস্কৃত জানা প্রথম ইংরেজ। তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রথম 'ভাগবদ্‌গীতা'র অনুবাদ

(১৭৮৫) করেন। এই অনুবাদই কোনো সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ। এরপর তিনি 'হিতোপদেশ' (১৭৮৭) ও মহাভারতের 'শকুন্তলা' উপাখ্যানের অনুবাদ (১৭৯৫) করেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রথম ছাপার কাজে দেবনাগরী হরফ ব্যবহৃত হয়। উইলকিন্সের রচনাবলীই ভারতবিদ্যাচর্চার সূত্রপাত করেছিল এবং সেগুলি পাঠ করে ইউরোপের পন্ডিত–মন্ডলী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি রূপে উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬–৯৪) ভারতবর্ষে আসেন। সুপন্ডিত ও বহুভাষাবিদ জোন্স ভারতে আসার আগেই প্রাচ্যদেশ সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা জানতেন এবং ভারতে আসার তিন বছরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি উইলিয়ম জোন্সের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় আগ্রহী উইলিয়ম জোন্স, স্যার রবার্ট চেম্বার্স, জন হাইড, হেনরী ভ্যান্সি-টার্ট, স্যার জন শোর, ফান্সিস গ্লাডউইন, চার্লস উইলকিন্স প্রভৃতি তিরিশজন ইউরোপীয়কে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সকলেই — "Agreed that the Society be established for the purpose of inquiring into the History and Antiquity, Art, Science and Literature of Asia."[১৭]

এই সভায় উইলিয়ম জোন্স " Discourses on the Institution of a Society for enquiring into the History civil and natural, the Antiquities, Arts, Sciences and Literature of Asia."
নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে সভা স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জোন্স বলেন — ".... You will investigate whatever is rare in the stupendous fabric of nature, will correct the geography of Asia by new observations and discoveries; will trace the annals, and

114048
23 AUG 1996
NORTH BENGAL
University Library
Raja Ra...

even traditions, of these nations, who from time to time peopled or desolated it; and will bring to light their various forms of government, with their institutions civil and religious; you will examine their improvements and methods in arithmetic and geometry, in trigonometry, mensuration, mechanics, optics, astronomy and general physics; their systems of morality, grammar, rhetoric and dialectic; their skill in chirurgery and medicine, and their advancement, whatever it may be, in anatomy and chemistry. To this you will add researches into their agriculture, manufactures, trade; and whilst you inquire with pleasure into their music, architecture, painting and poetry, will not neglect these inferior arts by which the comforts and even elegancies of social life are supplied are improved." [১৮]

জোন্সের এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, সোসাইটির প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কর্মধারা ছিল বহুবিচিত্রপথগামী।

জোন্সের এই প্রবন্ধ পাঠের পর সভায় উপস্থিত সকলে — "Resolved that the thanks of the Society be presented to Sir William Jones for the discourse with which he has favoured them. The Society agreeable to thepurport of the above discourse now assumed to themselves the name of the 'ASIATICK SOCIETY'." [১৯]

সোসাইটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২২শে জানুয়ারী, ১৭৮৪। এই সভায় ওয়ারেন হেস্টিংসকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই মর্মে অনুরোধ করে তাঁকে চিঠি দেওয়া হয়। তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৯শে জানুয়ারী, ১৭৮৪। ৩০শে জানুয়ারী, ১৭৮৪ ওয়ারেন হেস্টিংস সময়ের অভাবে সভাপতির পদ গ্রহণে অস্বীকার করে চিঠি দেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৪ সোসাইটির চতুর্থ সভায় উইলিয়ম জোন্সকে সর্বসম্মতভাবে সভাপতি

নির্বাচন করা হয়। জোন্স আমৃত্যু (২৭শে এপ্রিল, ১৭৯৪) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উইলিয়ম জোন্স ভাল সংস্কৃত জানতেন এবং শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদ (১৭৮৯), গীতগোবিন্দের ইংরেজি অনুবাদ (১৭৯১) ও ঋতুসংহার সম্পাদনার (১৭৯২) জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পান্ডিত্যের প্রকৃত খ্যাতি নিহিত আছে এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন সভা ও পত্রিকার জন্য লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলীর মধ্যে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী, এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধে উইলিয়ম জোন্স বলেছিলেন — "The Sanskrit Language, whatever be its antiquity, is of a wanderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to boath of them a strong affinity both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; So strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists." [৩০]

জোন্সের এই বক্তব্যই পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে গভীর প্রেরণার সঞ্চার করে এবং উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ঐতিহ্যচেতনা যুক্ত হয়ে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে।

পরবর্তীকালে জোন্সের এই বক্তব্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ভাষাচার্য্য সুনীতি কুমার বলেছেন — " এই যে, দিব্যদৃষ্টিতে স্যার উইলিয়ম জোন্স দেখিলেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন পারসিক, কেল্টিক, গথিক প্রভৃতির পশ্চাতে তাহাদের জননী স্বরূপ এক আদি আর্যভাষা বিদ্যমান ছিল, ইহারই আধারে ইউরোপে কতকগুলি নূতন মানবিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হইল — যেমন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বাক্‌তত্ত্ব ইত্যাদি। " [৩১]

সোসাইটি পরিকল্পনার সময় জোন্স Asiatick Miscellany নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশের কথা বলেছিলেন, কিন্তু প্রথম তিন বছর সে জাতীয় কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'Asiatick Researches' নামে সোসাইটির পত্রিকার প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এরপর ১৭৯০, ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে Asiatick Researches - এর পরবর্তী খন্ডগুলি প্রকাশিত হয়। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে Asiatick Researches প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্য না পাওয়ায় ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলিক ও মূল্যবান প্রবন্ধগুলি পন্ডিত-সমাজে সমাদর লাভ করেছিল।

Asiatick Researches - পত্রিকাতেই (Vol.I, P.118-128) ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত চার্লস উইলকিন্স কৃত গরুড় স্তম্ভলিপির ইংরেজি মর্মানুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে পুরাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত ঘটে এবং বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে পন্ডিত সমাজের মনে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হয়।

দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নাম স্থানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি কুঠি বাড়ি ছিল। তার অধ্যক্ষ স্যার চার্লস উইলকিন্স ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে বাদালের তিন মাইল দূরে এক বনভূমির মধ্যে এই স্তম্ভলিপিটি আবিষ্কার করেন। বাদালের কাছে অবস্থিত বলে অনেকে একে 'বাদাল-প্রস্তর-লিপি' এবং বাদালের চেয়ে মঙ্গলবারি হাটের আরও কাছে অবস্থিত বলে কেউ কেউ এটিকে 'মঙ্গলবারি-প্রস্তর-লিপি' বলে থাকেন। কিন্তু 'গরুড়-স্তম্ভলিপি' নামেই এটির পরিচয় সমধিক।

এই বারো ফুট উঁচু প্রস্তর স্তম্ভটি আবিষ্কারের সময় একদিকে হেলে ছিল এবং এর বজ্রদীর্ণ শীর্ষভাগ দ্বিধা বিভক্ত ছিল। Asiatick Researches পত্রিকায় স্তম্ভটির একটি ছবিও দেওয়া হয়েছিল। এই স্তম্ভের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ২৮টি পংক্তি আছে। এই লিপিটিকে একটি 'অষ্টাবিংশতি শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য'-ও বলা চলে। পংক্তিগুলি প্রায় প্রতিটি এক ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ এবং এক একটি অক্ষরের আয়তন প্রায়

আধ ইঞ্চি হবে। ১, ২, ২৩, ২৫, ও ২৭ সংখ্যক শ্লোকের কোন কোন অক্ষর প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু অন্যান্য অক্ষরাবলী অত্যন্ত সুদৃশ্য ও সুখপাঠ্য।

এই লিপি থেকে আমরা ধর্মপাল, দেবপাল, শূরপাল (মতান্তরে প্রথম বিগ্রহ পাল), নারায়ণ পাল প্রভৃতি পালবংশীয় রাজাদের নাম জানতে পারি। আমরা জানতে পারি যে, পালবংশীয় রাজারা বাঙালি ছিলেন এবং তাঁরা প্রথমে বাংলাদেশ অধিকার করে পরে মগধ জয় করেন। স্তম্ভলিপির ত্রয়োদশ পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, গৌড়েশ্বর (দেব পালদেব) উৎকলকুল উৎকিলিত করে, হূনগর্ব খর্ব করে, দ্রাবিড় গুর্জরনাথ গর্ব খর্ব করেছিলেন।

চার্লস উইলকিন্স মুদ্রাযন্ত্রে বাংলা টাইপের ব্যবহার করে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নবযুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি গরুড়-স্তম্ভ লিপি আবিষ্কার এবং তার ইংরেজি মর্মানুবাদ প্রকাশ করে বাংলা পুরাতত্ত্ব সাধনার ক্ষেত্রে সূত্রধারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

উইলকিন্সের পরে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭)-এর নাম করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে কোলব্রুকই বাঙ্গার প্রত্নতত্ত্ব চর্চার প্রতিষ্ঠাতা ; তিনিই জোন্সের আরব্ধ অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার প্রয়াস করেন।

দিনাজপুর জেলায় আবিষ্কৃত রণকঙ্কমল্লদেবের ময়নামতী লিপি এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের আমগাছি লিপির মূল সংস্কৃত পাঠসহ কোলব্রুক কৃত ইংরেজি অনুবাদ ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে Asiatic Researches পত্রিকায় (Vol.IX, P.398-407 and P.442-446) প্রকাশিত হয়। এর ফলে কোলব্রুকের হাতেই বাংলাদেশে প্রত্ন-তত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত ঘটে।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলায়, বাদাল থেকে চোদ্দ মাইল দূরে সুলতান-পুরের আমগাছি গ্রামে এক কৃষক মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি তাম্রশাসন পায়। তাম্রশাসনটি সে পুলিশের কাছে জমা দিলে সেটি ম্যাজিস্ট্রেট জে.পয়টেলের মাধ্যমে এশিয়াটিক সোসাইটিতে আসে। ১৪ ইঞ্চি উঁচু ও ১৩ ইঞ্চি চওড়া কারুকার্য খচিত পিতলের ফ্রেমে আবদ্ধ এই

তাম্রশাসনটি একটি দানপত্র। দানপত্রটি দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। দাতা তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব। দাতা এই দানপত্রে তাঁর পূর্বপুরুষদের নামোল্লেখ করেছেন। কোলব্রুক নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত নামোল্লেখের পাঠ নিয়েছেন — "The first prince mentioned is LOCAPALA, and after him DHARMAPALA. The next name has not been decyphered; but the following one is JAYAPALA, succeeded by DEVAPALA. Two or three subsequent names are yet undecyphered [one seems to be NARAYANPALA]; they are followed by RAJAPALA, — PALADEVA, and subsequently MAHIPALADEVA, NAYAPALA and again VIGRAHAPALADEVA." [৩২]

পরবর্তীকালে এই আমগাছিলিপি এবং ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত গরুড়-স্তম্ভলিপির সাহায্যেই ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশের পালরাজবংশের মূল কাঠামোটি জানতে পারেন।

শুধু রাজবংশের ইতিহাস নয়, কোলব্রুক বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনারও সূত্রপাত করেন। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে Asiatic Researches পত্রিকায় (Vol.VI, P.53-67) প্রকাশিত কোলব্রুকের 'Enumaration of Indian Classes' প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনার সূচনা হয়। কোলব্রুক বলেছেন, এই প্রবন্ধ লেখার জন্য — ".... I shall use, is the Jatimala, or Garland of classes; an extract from the Rudrayamala Tantra, which in some instances corresponds better with usege, and received opinions, than the ordiance of MENU, and the great D'herma-Purana." [৩৩]

কোলব্রুকের এই প্রবন্ধের পর আজ প্রায় দু'শ বছর পূর্ণ হতে চলল, কিন্তু বাঙালির দুর্ভাগ্য এই যে, আজও বাঙালির পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস রচিত হল না।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত Asiatick Researches পত্রিকাটি যে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি পত্রিকার কথা বলব, যার জন্য Asiatick Society নামটি পরিবর্তিত হয়ে Asiatick Society of

Bengal হয়ে গেল।

১৮২৯ থেকে '৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন হারবার্ট Gleanings in Science নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। পরবর্তীকালে জেম্‌স প্রিন্সেপ এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং সোসাইটির অনুমতিক্রমে পত্রিকাটির নাম রাখেন 'The journal of the Asiatick Society', — অন্ততঃ প্রথম সংখ্যায় সে নামই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এই নাম পরিবর্তন করে পত্রিকার নামকরণ করেন — 'The journal of the Asiatick Society of Bengal.' খুব সম্ভব, একটি স্থানিক নামের স্বতন্ত্র মাত্রা তিনি দিতে চেয়েছিলেন। এই পরিবর্তন সোসাইটির নজরে আসেনি। পত্রিকাটি Asiatick Researches অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রিন্সেপের অবসর গ্রহণের পর সোসাইটি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে যখন পত্রিকাটির পরিচালন ভার গ্রহণ করে তখন পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই পত্রিকার নাম পরিবর্তন না করে Asiatick Society - র নাম পরিবর্তন করে Asiatick Society of Bengal রাখা হয় এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রনিয়মালী সংশোধনের দ্বারা এই পরিবর্তন স্বীকৃতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে 'Asiatick Society of Great Britain and Ireland' প্রতিষ্ঠিত হলে, তারা কলকাতার Asiatick Society - কে Asiatick Society of Bengal নামকরণের অনুরোধ করেছিল, কিন্তু সোসাইটি তখন সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত Asiatick Researches এবং The journal of the Asiatick Society of Bengal - এই পত্রিকা দুটির সঙ্গে সঙ্গে সোসাইটি প্রকাশিত প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর কথা বলতে হয়, যার মধ্যে অনেক গ্রন্থই বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য-বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'বিবিলিওথিকা ইন্ডিকা' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির শতবার্ষিকীর সময়, প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক মোট ১৪০টি প্রকাশিত বা প্রকাশিতব্য গ্রন্থের মধ্যে ১১১টি ছিল 'বিবিলিওথিকা ইন্ডিকা'র অন্তর্গত। এর মধ্যে একদিকে আছে ফারসী ভাষায় রচিত প্রায় সব বিখ্যাত প্রাচীন বই,

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মূল পাঠের সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ। অন্যদিকে আছে বৈদিক সাহিত্য সংক্রান্ত চব্বিশটি বই, তিনটি পুরাণ, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আইন, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন - "It is doutful if any society in Europe has within fifty years, done any classic literature as much as the Asiatick Society of Bengal has done for Sanskrit literature since 1847." ৩৪

এশিয়াটিক সোসাইটি কেবল গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্বই নেয়নি, সংস্কৃত ও আরবী - ফারসী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সন্ধান ও সংরক্ষণ করেছে। শুধু ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণার কাজই নয়, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, মানচিত্র নির্মাণ প্রভৃতি কাজেও সোসাইটি সমান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাই প্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন — " অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ফরাসি বিপ্লবের ফলে যে সময়ে ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে নূতন যুগের সূচনা হচ্ছিল, ঠিক সে সময়েই উক্ত এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে স্যার চার্লস উইলকিন্স, স্যার উইলিয়ম জোন্স, এইচ.টি.কোলব্রুক-প্রমুখ মনীষী-দের প্রবর্তনায় ভারতীয় সংস্কৃতি জগতের আবিষ্কারের ফলে বাংলা দেশেও এক নূতন যুগের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। আর সে দ্বার হচ্ছে পুরাবৃত্তের দ্বার। এই দ্বারপথে প্রবেশ করে বাঙালির মন ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির যে আশ্চর্য সাতমহলা প্রাসাদ আবিষ্কার করল, তার মহলে মহলে যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেল, তাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবশেষে এই পুরাজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে ওই সাতমহলা ভবনের কেন্দ্রবর্তিনী ভারতীয় প্রাণলক্ষ্মী যখন দীর্ঘ-সুপ্তির অবসানে নবপ্রভাতের আলোকে জেগে উঠলেন, তখন দেশে যে নবচেতনার সাড়া দেখা দিল ভারতীয় ইতিহাসে তার তুলনা নেই। ওই প্রবেশ পথেই বাংলা দেশের পুরাবৃত্তের কক্ষচিত্ত ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত হল ; কিন্তু সেই অন্ধকার কক্ষের বিভিন্ন অংশকে যথোচিত আলোকিত করতে অতি দীর্ঘকালব্যাপী পুরচর্চার প্রয়োজন হয়েছে। " ৩৫

আধুনিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস রচনা করেন Charles Stewart. ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর The History of Bengal গ্রন্থটি প্রকাশিত

হয়। গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই গ্রন্থে বাংলাদেশে মুসলমান অভিযান থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বঙ্গবিজয় পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস আলোচিত হয়নি। তবে বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাসের প্রশ্নে লেখক সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন — "In a work professing to be a History of Bengal, it will probably be expected to find some account of the original inhabitants of the country; and a detail of their gradual rise, from a state of barbarism, to that high degree of civilization in which they were found when first visited by Europeans. In both this respects, I am sorry to say, the reader will be disappointed. Although the Hindoos of Bengal have an equal claim to antiauity and early civilization with the other nations of India, yet we have not any authentic information respecting them during the early ages of their progress; nor is there any other possitive evidence of the ancient existance of Bengal, as a separate kingdom, for any considerable period, than its distinct language and peculair written character." [৩৬]

বাংলাদেশের কোনো "account of the state of the civilization or of the progress of the arts and science" [৩৭] দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে স্টুয়ার্ট দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, "As I am credibly informed that materials have been and are still collecting for furnishing an authentic account of the Hindu Governments, I shall dwell no longer on the subject, in the hope that we shall one day be favoured with a history of Bengal from the pure mine of Sanskrit Literature." [৩৮]

বাংলার ইতিহাস রচনার সময় স্টুয়ার্ট একাধিক গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন, এবং সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "I have annexed a list of the books consulted in the compilation of this work; not with a view of making a parade of oriental learning, but to evidence that great pains have been taken to collect the best information that could be obtained." ৩১

পাঠকের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তিনি গ্রন্থ মধ্যে বাংলা ও বিহারের পূর্ণাঙ্গ এবং উড়িষ্যা ও আরাকানের আংশিক পরিচয় সমন্বিত একটি মানচিত্র সংযুক্ত করেন এবং ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলার নবাবদের একটি নামের তালিকা দেন।

বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লেখক তাঁর সীমাবদ্ধতা ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ; সে কারণে তিনি বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন — "Many things, however, have probably escaped my attention; and as gentlemen residing in Bengal may by their local inquiries, be enable to detect mistakes and to explain some points upon which I have expressed doubts, I shall consider myself obliged to any person who will furnish me with the means of suppling omission, or of correcting errors." [80]

স্টুয়ার্টের ইতিহাস স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে রচিত হয়নি। কিন্তু Council of Education-এর অনুমোদন ও সুপারিশ ক্রমে সরকারী স্কুল কলেজে গ্রন্থটি পাঠ্য হলে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে এর একটি সরকারী শিক্ষা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ অবলম্বনেই ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটির বঙ্গবাসী সংস্করণ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্টের গ্রন্থের প্রশংসা করতে পারেন নি। বিদ্রূপ করে তিনি বলেছেন — "স্টুয়ার্ট সাহেবের বই এত বড় ভারী যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয় ....।" [৪১] কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, — "We have much pleasure to place

in the hands of the public the best History of Bengal ever written or published. Stewart's History of Bengal is not only the best but also the first work that was ever written on the subject. Ninety years have passed since this book was first published .... Major Stewart's History of Bengal still holds the ground as the standard work on the subject."[৪২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে গ্রন্থটি নিন্দনীয় হলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সে মত পরিবর্তিত হয়েছে।

জাতির হৃদয়ে ইতিহাস চেতনা সঞ্চার করার দুটি পথ আছে — এক, সাহিত্য, দুই, শিক্ষা। চৈতন্যজীবনী কাব্য বাদ দিলে বাঙালির ইতিহাস-সাহিত্য ছিল না। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলাদেশের নবশিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু শিক্ষালয়ে ইতিহাস শিক্ষা তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেকলে ও বড়লাট বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে বাংলাদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হলে শিক্ষালয়ে ইতিহাস শিক্ষার শুভ সূচনা হল। সিনিয়র সেক্শনের শিক্ষার্থীদের জন্য 'ভারতেতিহাস' এবং জুনিয়র সেক্শনের জন্য 'বঙ্গেতিহাস' পাঠ্য করা হল। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে খ্যাত-নামা ঐতিহাসিক জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে History of India এবং ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে History of Bengal রচনা করলেন।

History of Bengal গ্রন্থটির পূর্ণনাম 'Outline of the History of Bengal compiled for the use of youths in India'. গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে, "It presents a brief and simple outline of the History of Bengal from the Voidya dynasty to the close of Lord William Bentinck's administration."[৪৩]

বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার জন্য মার্শম্যান যে সব গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, ভূমিকায় তার একটি তালিকা আছে। এইসব গ্রন্থের মধ্যে স্টুয়ার্টের History of Bengal গোলাম হুসেনের 'সয়ের মুতাক্ষরিণ' এবং ফেরিস্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মার্শম্যানের History of Bengal স্টুয়ার্টের History of Bengal অপেক্ষা আকারে ছোট ; উনিশটি পরিচ্ছেদে প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠায় রচিত। কিন্তু প্রকৃতিতে মার্শম্যানের ইতিহাস গ্রন্থটি স্টুয়ার্টের গ্রন্থ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। স্টুয়ার্টের ইতিহাস মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস, সেখানে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার কথা নেই। কিন্তু মার্শম্যান তাঁর গ্রন্থে মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠার প্রথম পরিচ্ছেদে — Obscurity of the early history of Bengal, the three ancient capital - Gour, Sonargong and Satgong, Adisoor, Bullal Sen and the Vaidya roll of Kings, Ancient division of Bengal -

এর কথা যেমন বলেছেন তেমনি আধুনিক বাংলার ইতিহাসকে বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন।

প্রসঙ্গত: বলা দরকার যে, যদিও বাংলার সেন রাজারা বর্ণে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু ভুল বশত: মার্শম্যান তাঁদের বৈদ্যরূপে চিহ্নিত করায়, বাংলার সেন রাজারা বৈদ্য ছিলেন, — আজও এই ভুল ধারনা সাধারণ মানুষের মনে সযত্নে লালিত আছে। তবে ইতিহাসের সচেতন পাঠক এ ত্রুটি মুক্ত।

মার্শম্যানের History of Bengal গ্রন্থটি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন শিক্ষালয়ের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচিত হত। খুব সম্ভব সে কারণেই গ্রন্থটির একাধিক বঙ্গানুবাদ হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন গোবিন্দ চন্দ্র সেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগ অনুবাদ করেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই অনুবাদে পলাশীর যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে নবাব আলিবর্দির শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস স্থান পেয়েছে। এইভাবে, অনুবাদের মধ্য দিয়েই, বাংলা সাহিত্যে বাংলার ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয় এবং বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে ইতিহাস-চর্চা ও চেতনার প্রসার ঘটে।

এরপর, বেন্টিঙ্কের পরবর্তীকাল থেকে বাংলার ছোটলাট নর্ড বীডনের শাসন-কাল পর্যন্ত (১৮৩২–৬৭) 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তৃতীয় ভাগ, রচনা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এটি কোনো ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ নয়, ভূদেবের স্বাধীন রচনা। এই ইতিহাস ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়ে প্রথমাংশ 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রিকায় এবং শেষাংশ 'এডুকেশন গেজেট'–এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই ইতিহাস–বর্ণিত ঘটনাবলী লেখকের জীবনকালেই (১৮২৭–৯৪) সংঘটিত হয়েছিল এবং লেখক তার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন বলে এই রচনার স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই রচনা ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে রোপার লেথব্রিজ রচিত 'An Easy Introduction of the History and Geography of Bengal নামক গ্রন্থটির কথা বলতে হয়। গ্রন্থটি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য রচিত হয়েছিল। মাত্র ১১৮ পৃষ্ঠায় নয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি রচিত। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস, তৃতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে মুসলমান রাজত্বের কথা, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ইংরেজ রাজত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় লেখক যে সব ঐতিহাসিকের গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন তাঁদের নামের তালিকা লেখক ভূমিকায় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Prof. Lassen, E.V.Westmacott, Henery Elliot, Prof. Blochmann, E.Thomas এবং Charles Stewort এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্কুল পাঠ্য গ্রন্থের বাইরে, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত W.W.Hunter এর 'The Annals of Rural Bengal' ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত J.Westland–এর 'A Report on the District of Jessore', এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত W.W. Hunter –এর 'A Statistical Account of Bengal' গ্রন্থের কথা বলতে হয়। The Annals of Rural Bengal বাংলাদেশের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের নানা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

A Statistical Account of Bengal গ্রন্থটির প্রায় একই শ্রেণীর রচনা এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ থেকে 'দেবী-চৌধুরাণী' উপন্যাসের উপাদান পেয়েছেন। ওয়েস্টলান্ডের গ্রন্থে যশোহরের ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও বাণিজ্যিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনীর অনেকটাই গ্রহণ করেছেন ওয়েস্টলান্ডের গ্রন্থ থেকে।

এই প্রসঙ্গে 'Contribution to the Geography and History of Bengal' (Muhammedan period) - এই নামে Professor H.Blochmann যে তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সেগুলির কথাও স্মরণ করতে হয়। প্রবন্ধগুলি Journals of the Asiatick Society of Bengal এ যথাক্রমে 1873 (Part-I, No.3), 1874 (Part-I,No.f) এবং 1875 (Part-I, No.3-তে প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে তিনটি রচনা সম্পর্কে লেখক বলেছেন যে, —"In the end of last year, General Cunninghum, Director of the Archaeological Survey of India, forwarded to the Asiatic Society, for publication in the journal, a unique collection rubbings of Mahammedan inscriptions from Bengal and various places up-country, and in the proceedings of our Society for January last. I gave an account of the importance of these rubbings with reference to the history of Bengal." [৪৪]

এই প্রবন্ধ তিনটি রচনার সময় লেখক স্বয়ং শিলালেখ, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি ভাল-ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন।

মুসলমানদের বঙ্গবিজয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা' লক্ষ্য করার মত — "But it would be wrong to believe that Bakhtyar Khilji conquered the whole of Bengal". [৪৫]

এর মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতেরই অনুবর্তী। প্রবন্ধ তিনটিতে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের আলোচনা আছে।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থটির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সম্বন্ধ নির্ণয়' বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম গ্রন্থ। বাংলার ইতিহাস চর্চা যাঁরা করেছেন তাঁরা হয় ইংরেজ না হয় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলার রাষ্ট্রীয় উত্থান - পতন এবং শাসনপদ্ধতির বিবর্তন। কিন্তু লালমোহন বিদ্যানিধি সম্পূর্ণ প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও পাশ্চাত্য ইতিহাস চর্চার সাম্প্রতিকতম শাখা অবলম্বন করেছিলেন। 'সম্বন্ধ নির্ণয়' বাংলাদেশের সমাজবিন্যাস সংক্রান্ত ইতিহাস। ভারতীয় মনে সমাজবিন্যাসের বিষয় সর্বাধিক আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রন্থটির ইংরেজি আখ্যানপত্রে লেখা A Social History of the principal Hindu Castes in Bengal কথাটি আমাদের মনে পাশ্চাত্য প্রেরণার ধারণা দেয় এবং সেই সঙ্গে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে E.B.Cowell - এর টীকা সহ H.T.Colebrooke - এর 'Enumeration of Indian Classes' প্রবন্ধটির গ্রন্থাকারে প্রকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্কিম চন্দ্র 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থটির উচ্চ-প্রশংসা করেছেন।[৪৬]

পরিশেষে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় দুই 'ইতিহাসবেত্তা' — (১) রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং (২) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — এর কথা বলব। ইতিহাসবেত্তা হিসাবে রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত হলেও বাংলার ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গবেষণা প্রায় নেই বললেই চলে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য (বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধার), তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন।"[৪৭] রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও অভিমানাহত বেদনাবোধ নিহিত আছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'On the Pala and Sena Dynasties of Bengal নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের

মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনার সূচনা করেন। পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধটি তাঁর Indo Aryans নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে (১৮৮১) অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "পন্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাল বংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখন্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পন্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হয় নাই।" [৪৮]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সমসাময়িক কালে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের সাহায্যে পালরাজাদের বংশতালিকা ও কালনির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি পাল রাজাদের যে কালানুক্রমিক বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :-

১.	গোপাল ...	৮৫৫ খ্রিঃ
২.	ধর্মপাল ...	৮৭৫ খ্রিঃ
৩.	দেবপাল ...	৮৯৫ খ্রিঃ
৪.	প্রথম বিগ্রহপাল ...	৯১৫ খ্রিঃ
৫.	নারায়ণ পাল ...	৯৩৫ খ্রিঃ
৬.	রাজ্যপাল ...	৯৫৫ খ্রিঃ
৭.	——— পাল ...	৯৭৫ খ্রিঃ
৮.	দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ...	৯৯৫ খ্রিঃ
৯.	মহীপাল ...	১০১৫ – ১০৪০ খ্রিঃ
১০.	নয়পাল ...	১০৬০ খ্রিঃ
১১.	তৃতীয় বিগ্রহপাল ...	১০৮০ খ্রিঃ

পালরাজাদের কালনির্দেশে রাজেন্দ্রলাল অনেকখানি অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন। ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'সারনাথ লিপি' থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, মহীপালের রাজত্বকাল ১০১৫–১০৪০ খ্রিস্টাব্দে। এই ধারণা থেকে তিনি ২০ বছরে এক পুরুষ ধরে গোপালের রাজত্বকাল ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল

১০৮০ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন। কিন্তু জেনারেল কানিংহাম ২৫ বছরে এক পুরুষ ধরে গোপালের রাজত্বকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে স্থির করেছেন। বলা বাহুল্য আধুনিক গবেষণায় কানিংহামের অনুমানই সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ১০৫৫–৭০ খ্রিস্টাব্দ ধরা হয়েছে। আধুনিক গবেষণায় রাজেন্দ্রলাল প্রদত্ত পালরাজাদের নামের তালিকা মোটামুটি সমর্থিত। তবে তিনি তৃতীয় বিগ্রহপালের পরবর্তী পালরাজাদের নাম দেননি। তাঁরা হলেন — দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০–৭৫ খ্রিঃ), দ্বিতীয় শূরপাল (১০৭৫–৭৭ খ্রিঃ), রামপাল (১০৭৭–১১২০ খ্রিঃ), কুমারপাল (১১২০–২৫ খ্রিঃ), তৃতীয় গোপাল (১১২৫–৪০ খ্রিঃ), মদনপাল (১১৪০–৫ খ্রিঃ)।

পালরাজাদের মতো সেন রাজাদের কাল নির্দেশের ক্ষেত্রেও রাজেন্দ্রলাল অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি বলেছেন — **".... of the predecessors of Ballala we have lapidly proofs of four names, Vijaya Sena, Hemanta Sena, Sumanta Sena, and Vira Sena, but no authentic date about any of them. For the present their dates must be fixed by taking averages. At an average of 18 years, their reigns would extended to 944 A.D., or at 20 years, which I have relunctantly assigned to the Pala, to 986 A.D."** [৪৯]

অর্থাৎ রাজেন্দ্রলাল বীরসেনের রাজ্যাভিষেক কাল ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন এবং সেই অনুসারে সামন্ত সেন – ১০০৬ খ্রিঃ, হেমন্ত সেন – ১০২৬ খ্রিঃ, বিজয় সেন – ১০৪৬ খ্রিঃ, বল্লাল সেন — ১০৬৬ খ্রিঃ এবং লক্ষ্মণ সেন – ১১০৬ খ্রিঃ বলেছেন। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে লক্ষ্মণ সেন ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

সেন রাজাদের কালনির্ধারক বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য থাকলেও বংশতালিকা নির্ধারণে বহুলাংশে ঐকমত্য হয়েছেন। সেন রাজাদের বংশ তালিকা নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি কুলপাঞ্জিকাগুলির উপর নির্ভর না করে, শিলা–লিপি, তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক প্রভৃতি পাথুরে প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন। এই বংশের আদিরাজা আদি শূরকে নিয়ে তিনি কিছুটা বিভ্রান্তবোধ করেছেন, এবং অনুমান করেছেন

যে, সেন রাজবংশের আদিপুরুষ বীর সেন ও আদিশূর অভিন্ন হতে পারেন। কিন্তু কিংবদন্তীমূলক চরিত্র হওয়ায় রাজেন্দ্রলাল তাকে বাদ দিয়েছেন। সেনরাজারা বৈদ্য ছিলেন, এ বিশ্বাস বাংলাদেশে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল বাগখরগঞ্জ ও রাজশাহী লিপির সাহায্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করেন যে, সেন রাজারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধটি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক মন্তব্যের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তার কয়েকটা উদ্ধৃত করছি। যথা —

(১) " আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লাল সেন ১০৬৬ খ্রিঃ অব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।"[৫০]

(২) " মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে ভকীভূত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন।" [৫১]

(৩) " ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তারপর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেনবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। " [৫২]

পাল এবং সেনবংশীয়েরা ' এককালে এক সময়েই' রাজত্ব করতেন — বঙ্কিমচন্দ্রের এই মত গড়ে উঠেছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাল ও সেন রাজাদের কালনির্ণয়ক আলোচনা থেকে। যদিও রাজেন্দ্রলালের এই কালনির্ণয় অভ্রান্ত নয়।

বাংলা সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাঁরা করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে তাঁরা ভুলতে পারেন না। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা/১২৮২, জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত তাঁর 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটির গবেষণামূল্য আজও অটুট বিদ্যাপতি যে মিথিলার কবি, সে তথ্য কালনির্ণয় সহ প্রথম প্রকাশ করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আর একটি কারণে আমরা রাজকৃষ্ণবাবুকে ভুলতে পারব না, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের জন্য। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসটি আমরা যেমন মনে রাখি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার কল্যাণে, তেমনি রাজকৃষ্ণের বাঙ্গালার ইতিহাসের কথা আমরা ভুলতে পারি না বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার গুণে। গ্রন্থটি সামান্য কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার গুণে তা' অসামান্য হয়ে উঠেছে। তবে অসামান্যতা নিশ্চয়ই কিছু ছিল, "নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করিনা।" ৫৩

কিন্তু, কি সেই অসামান্যতা, যার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষী গ্রন্থটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা' বিচার করে দেখতে হবে। আমরা জানি যে, স্টুয়ার্ট, মার্শ্‌-ম্যান, লেথব্রিজ রচিত বাংলার ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রকে তৃপ্ত করতে পারেনি। কারণ, এই গ্রন্থগুলিতে স্বদেশের পুরাবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিতরূপে ধরা দেয়নি। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইচ্ছা করলে স্বদেশের পুরাবৃত্ত উদ্ধার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা' করেন নি।

বাংলার ইতিহাসহীনতা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে যে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছিল তার অংশত উপশম ঘটিয়েছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

মুষ্টি ভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোট ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে ; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।" ৫৪

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাজকৃষ্ণবাবুর বাংলার ইতিহাসের দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থে 'অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য' তথ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ 'ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে ; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস ।'

রাজকৃষ্ণবাবুর ইতিহাসের প্রথম বৈশিষ্ট্যের সমর্থনে পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — "His little work on the History of Bengal throws a flood of light upon an unexplored region of historical research. It is a little unpretentions which more ambitious authors would hesitate to call a book, but in point of research and learning, it stands unsurpassed among the modern works on the History of Bengal." [৫৫]

বাংলার ইতিহাস স্কুলপাঠ্য পুস্তক। তার আগে স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান বাঙালীর ইতিহাস লিখেছেন। রাজকৃষ্ণবাবুর ইতিহাসে 'অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য' কথা আছে বলতে স্টুয়ার্ট , মার্শম্যান প্রভৃতি ইতিহাস রচয়িতাদের অপেক্ষা নতুন তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলা হয়েছে। 'বাংলার ইতিহাস' কোন আকর গ্রন্থ নয়। কিন্তু এটি রচনার জন্য বহু আকর গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। ইংরেজ লেখকদের রচিত বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট ও সেন্সার রিপোর্ট ভিন্ন একদিকে ফা - হিয়েন, হিউয়েন সাঙের বিবরণ, আইন-ই-আকবরী, সয়ের মুতাক্ষরিণ প্রভৃতি গ্রন্থ অপরদিকে মুরের সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ফিতীবংশাবলীচরিত, মহাবংশ এবং রজনীকান্ত গুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির প্রবন্ধ থেকে এ গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে।

রাজকৃষ্ণবাবু তাঁর গ্রন্থে রাজাদের নাম ও যুদ্ধতালিকার পরিবর্তে জাতি হিসাবে বাঙালির কীর্তি ও বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনৈতিক উত্থান-পতন নয়, বাঙালি জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, স্থাপত্য ও সমাজ বিন্যাসের বিশিষ্টতার উপরেই এ গ্রন্থ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেই সঙ্গে আছে বাঙালির অতীত গৌরব ও কৃতীর্যের কথা। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এটি যথার্থ সামাজিক ইতিহাস।

রাজকৃষ্ণবাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর সমালোচনা প্রকাশিত হবার পরেই কমলাকান্তের 'একটি গীত' প্রকাশিত হয়ে দেশপ্রীতির প্রবল উচ্ছ্বাসে সাহিত্যভূমি প্লাবিত করল। রাজকৃষ্ণবাবু বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করলেন না দেখে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যকে প্রবৃত্ত করার জন্য — বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করলেন। এই গ্রন্থই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্পর্কে গভীরতর গৌরবগর্ব ও অহঙ্কারের জন্ম দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বাংলার ইতিহাসহীনতার জন্য গভীর বেদনাবোধ ছিল। ইংরেজদের লেখা বাংলাদেশের ইতিহাসগুলি তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তিনি বলেছেন — " মার্শমান্, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি ; সে কেবল সাধ-পূরাণ মাত্র।" [৫৬] তিনি মার্শম্যান্, লেথব্রিজ প্রভৃতির লেখা বাংলার ইতিহাসকে 'চুটকিতালে' 'টাকা রোজগার'-এর জন্য লেখা ইতিহাস বলে নিন্দা করেছেন। [৫৭] পক্ষান্তরে রাজকৃষ্ণবাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থকে 'সুবর্ণের মুষ্ঠি' বলে তুয়সী প্রশংসা করেছেন।

এর কারণ, প্রথমতঃ কোনো বিদেশীর পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেশ ও সমাজের প্রকৃত সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন। কি কারণে প্রাচীন সংস্কৃতির শিকড় আমাদের সমাজের গভীরে অনেক বেশী দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছে তা' বোঝা কোন বিদেশীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এই কারণে — " .... অনভিজ্ঞ ইংরাজরা বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার পূর্ব গৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। " [৫৮]

দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন — " ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল।" [৫৯] এই কারণে তিনি বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস রচনা করার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষা আংশিক হলেও রাজকৃষ্ণবাবুর দ্বারা পূরণ হয়েছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজদের রচিত ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য — " আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধি ধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের

জন্ম, মৃত্যু, গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই।" ৬০

তৃতীয়তঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবোদ্বুদ্ধ শিক্ষা ও চেতনার আলোকে বাঙালির মনে যে দেশপ্রীতি ও জাতীয় গৌরববোধ জাগ্রত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র তারই আলোকে বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চেয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন ছিল — "বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত।" ৬১ তাই সে ইতিহাসে স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালির 'পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি' ছিল না। তাই বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের মূলগত সাধনাটি তখন তমসাচ্ছন্ন ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন।

চতুর্থতঃ ইংরেজরা বাংলার ইতিহাস চর্চা করেছেন শাসকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। দু'একজন ইউরোপীয়ের কথা বাদ দিলে তাঁদের ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সহায়তা করা। সি.এইচ.ফিলিপস্ বলেছেন- "Most of the British writers tended to give the history of British India significance in so far as it was held to teach Government some practical lessons for the future handling of affairs." ৬২

এইসব ইতিহাস বেত্তারা কখনোই স্বীকার করতে চাননি যে এদেশের এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও সুপ্রাচীন সভ্যতা ছিল। এ সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "Even when positive evidence was being brought to light about the pastgreatness of the Hindoos, there was a conscious and deliberate effort to minimize its importance. This was sought to be done in various ways. One was to deny the antiquity of Indian culture by suggesting that Indians borrowed most, if not the whole, if culture from the Greeks and where that appeared to have no basis from the Assyrians, persians, Babylonians etc." ৬৩

এর মূলে ছিল ইংরেজদের বিজয়ী মানসিকতা এবং শ্রেষ্ঠত্ববোধের আধিক্য। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "পক্ষপাত অপেক্ষা বিদ্বেষে ও সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশী বিকৃত করে। তাহা ছাড়া এক দেশের আদর্শ আর এক দেশে খাটাইবার প্রবৃত্তি বিদেশীর লেখনী মুখে আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতেও শুভ হয় না।"[৬৪]

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এই অশুভ প্রচেষ্টাই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। যে কারণে তিনি মন্তব্য করেছেন — "ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছু হইতে পারে না ; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই।" [৬৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর্যুক্ত মন্তব্যে অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা' নিরর্থক নয়। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় পন্ডিতদের সম্পর্কে আরও আক্রমনাত্মক মন্তব্য করেছেন — "ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পন্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভূত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাহাদের একথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুইচারিজন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত। তাহারা যত্ন পূর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসকলে যাহা কিছু আছে — হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া — সকলই আধুনিক, আর হিন্দু গ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্যদেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমারের কাব্যের অনুকরণ ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ ডিয় হইতে প্রাপ্ত ; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া ; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচার প্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষী গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে যায় তাহাই সত্য। পান্ডবদিগের ন্যায় বীনচরিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পান্ডব

কবি কল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পঞ্চপতি সত্য, কেন না, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চূয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফর্গুসন সাহেব অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলা বিবস্ত্রা স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পড়িত না ; এদিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্ মিস্ত্রীর। বেবর (weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও whitney সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজ বুদ্ধিতে এত করে।"[৬৬]

বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের সত্যতা আংশিক হলেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের পরিমিত রূপ আমরা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের কণ্ঠেও শুনেছি। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষোভ বহুলাংশে জাতীয়তাবোধ দ্বারা চালিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতবাসীর অন্তরে দেশের অতীতকে অবলম্বন করে দেশাত্মবোধ যে আত্মশ্লাঘার জন্ম দিয়েছিল তার অনিবার্য ফল হিসাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা কিছুই পাইনি একথা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যখন তাঁর অসামান্য মনীষা ও সত্যদৃষ্টির আলোকে বাংলার ইতিহাসের প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং বাংলার ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন তখন তাঁকে বহুলাংশে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। বেদ, পুরাণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডঃ মূরের Sanskrit Text থেকে নিয়েছেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি উইলসন এবং গোল্ডস্টুকারের মত অধিকাংশ সময় উদ্ধৃত করেছেন। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধ লেখার সময় উইলসন সম্পাদিত

Mackenzie's Collection - এর তালিকার উপর নির্ভর করেছেন। 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে তিনি 'শ্লেগেল, লাসেন, বেন্‌ফী, মোক্ষমূলর, স্পিজেল, রেণা, পিক্ত, মূর' প্রভৃতি ইউরোপীয় পন্ডিতদের মত গ্রহণ করেছেন। ডাল্‌টনের Ethnology of Bengal গ্রন্থটি তাঁর কাছে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। সুতরাং নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের দানকে অস্বীকার করা যায় না।

ইউরোপীয় পন্ডিতদের সম্পর্কে অত্যন্ত তিক্ত মন্তব্যের পরে, হেস্টির সঙ্গে বিরোধের সময়, অধিকতর পরিণত বঙ্কিমচন্দ্র তা' স্বীকার করেছেন —"No one question their scholarship, I can assure him that men like Max Muller, and Goldstucker, celebrooke and Muir, Weber and Roth do not stand in need of a champion like Mr.Hastie. I yield to none in my profound respect for their learning, their ability, and large - hearted philanthropy which leads them to devote themselves to pursuit from which my countrymen often recoil in fear and despair. And I, as a native of India would be certainly shamefully wanting in gratitude, if I did not acknowledge their great services in the dissemination of the Sanskrit language and learning throughout the civilized world." [৬৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্যে যে সুবিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা' উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকে নবজাগ্রত স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির কারণে বাঙালি যেমন একদিকে ইউরোপীয়দের প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করেছে তেমনি অপর দিকে জ্ঞানানুশীলনের প্রতি প্রদর্শন করেছে শ্রদ্ধা। এই বিদ্বেষ ও শ্রদ্ধাই যুগপৎ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে যে সত্যানুসন্ধিৎসার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তাই পরবর্তীকালে স্বদেশ, স্বজাতি ও ইতিহাসপ্রীতির সহযোগে তাঁকে সত্যানুসন্ধিৎসার সাধনায় নিমগ্ন করেছে।

।। সূত্র – নির্দেশ ।।

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ভারত-কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ২৩৪।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – কাদম্বরী, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খন্ড), ১৯৬৭, পৃঃ ৫৩৭।

৩। A. A. Macdonel – A History of Sanskrit Literature, 1971, p. 8.

৪। R. C. Majumder – Ideas of History in Sanskrit Literature, Ed. by C. H. Philips-Historians of India, Pakistan and Ceylon, 1961, p. 13.

৫। বিজন বিহারী গোস্বামী (অনুঃ ও সম্পাঃ) – অথর্ববেদ-সংহিতা, ১৫শ কান্ড, ১ম অনুবাক, ৬ষ্ঠ সূক্ত, ১১শ শ্লোক, ১৯৭৮, পৃঃ ৪৪৭।

৬। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস – মহাভারতম্ আদিপর্ব, অনুক্রমণিকাধ্যায়, ১৬ শ্লোক, অনুঃ ও সম্পাঃ - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ১৩৩৮, পৃঃ ১২।

৭। নলিনী নাথ রায় (অনুঃও সম্পাঃ) - ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭ম প্রপাঠক, ১ম খন্ড, ৪র্থ শ্লোক, ১৩৯৫, পৃঃ ৬০৯।

৮। Kautilya – Arthashastra Trn. & Ed. Raghu Nath Singh, 1983, p. 62.

৯। R. C. Majumder – Ibid, p. 14.

১০। Kalhana – Rajtarangini, Trn. & Ed. Vishva Bandhu, 1963, p. 4.

১১। R. C. Majumder – Ibid, p. 21.

১২। A.A.Macdonel – Ibid, p.9.

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – শিবাজী ও মারাঠা জাতি, ইতিহাস, (প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত), ১৩৬৮, পৃঃ ৫৬।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য়খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৩।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

১৭। সুকুমার সেন – ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৪০।

১৮। প্রবোধচন্দ্র সেন – বাঙ্গার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃঃ ৪৪।

১৯। Jadu Nath Sarkar – History of Bengal, Vol.II, 1948,p.49.

২০। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য়খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

২১। Syed Gholam Hossein – Seir-Mutaqherin, Trn. by M.Raymond, 1902, p.25.

২২। Ibid, p.23-24.

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।

২৪। যদুনাথ সরকার – মধ্যযুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের মশলা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৭ সন, পৃঃ ২৩৩।

২৫। Ghulam Husain Salim — Riyazu-s-Salatin
Trn. by Maulavi Abdus Salam, 1904, p.414.

২৬। যদুনাথ সরকার — প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫।

২৭। Sibdas Chaudhuri (Com. & ed.) — Proceedings of the Asiatick Society, Vol.I, (1784-1800), 1980, p.2.

২৮। William Jones — Discourse, Asiatic Researches, Vol.I, 1979 (Reprint), p.x.

২৯। Sibdas Chaudhuri — Ibid, p.6.

৩০। Ibid, p.77.

৩১। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় — 'ভূমিকা', গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত 'বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক', ১৯৬৫, পৃঃ-৭

৩২। H.T.Colebrooke — Inscription on a plate of copper found in the district DINAJPUR, Asiatick Researches, Vol.IX, 1979, (Reprint), p.443.

৩৩। H.T.Colebrooke — Enumeration of Indian Classes, Asiatick Researches, Vol.VI, 1979 (Reprint), p.53.

৩৪। Rajendralal Mitra — History of the Society, Centenary Review of the Asiatick Society of Bengal, Vol.I, 1884, p.65.

৩৫। প্রবোধ চন্দ্র সেন – বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃ: ১৬–১৭।

৩৬। Charles Stewart – History of Bengal, Preliminary Discourse, 1904 (Bangabasi), p.vii.

৩৭। Ibid, p.ii.

৩৮। Ibid, p.viii-ix.

৩৯। Ibid, p.vi.

৪০। Ibid, p.ix.

৪১। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩৬।

৪২। Charles Stewart – History of Bengal, Preface, 1904,p.1.

৪৩। John Clark Marshman – History of Bengal, 1846,p.i.

৪৪। H.Blochmann – Contributions of the Geography and history of Bengal (Muhammedan period), 1968 (Reprint), p.i.

৪৫। Ibid, p.3.

৪৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩২২।

৪৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য়খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩১।

৪৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩৬।

৪৯। Rajendralal Mitra — On the Pala and Sena Dynasties of Bengal, Indo Aryan, Vol.II,1881, p.258.

৫০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩২৪।

৫১। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৮।

৫২। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৪।

৫৩। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩১।

৫৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩১।

৫৫। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — উদ্ধৃতি, ভবতোষ দত্ত - সুবর্ণের মুষ্ঠি, বঙ্কিম ভাবনালোক, ১৯৮৮, পৃঃ ৬২।

৫৬। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩০।

৫৭। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৬।

৫৮। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৫।

৫৯। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

৬০। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩৬।

৬১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ, ইতিহাস (পুলিন বিহারী সেন ও প্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত) ১৩৬৮, পৃ: ১১৮।

৬২। C.H.Philips (ed.) – Editor's Introduction, Historians of India, Pakistan and Ceylon, 1967, p.8.

৬৩। R.C.Majumder – Quoted by R.K.Dasgupta, Macaulay's Writings on India, in C.H.Philips (ed.) - Historians of India,Pakistan and Ceylon, 1967, p.236.

৬৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ঐতিহাসিক চিত্র, ইতিহাস, (পুলিন বিহারী সেন ও প্রবোধ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত), ১৩৬৮, পৃ: ১৪০।

৬৫। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দ্রৌপদী, দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ১৯৭।

৬৬। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৪০৯–১০।

৬৭। Bankim Chandra Chatterjee – Letter in the Hastie Controversy, The Statesman, October 16,1882, Bankim Rachanavali (Vol.III), 1969, p.205.